গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ১৭ সংখ্যা | ৩ - ৯ ডিসেম্বর ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

জনগণের আমানত লুঠ করতেই ব্যাঙ্কিং বিল

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৪ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কিং আইন (সংশোধনী) বিল ২০২১ চরম জনস্বার্থবিরোধী। আমরা এই বিলের তীব্র প্রতিবাদ করছি। জনগণের টাকায় গড়ে ওঠা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সম্পদকে একচেটিয়া পুঁজি নিয়ন্ত্রিত কর্পোরেট মালিকদের হাতে তুলে দিতেই এই বিল এনেছে সরকার। সরকার লাগামছাড়া বেসরকারিকরণে উন্মত্ত, যাতে সাধারণ আমনতকারীদের কষ্টার্জিত সম্পদের নিরাপত্তা হরণ করা সহজ হয়। পুঁজি-মালিকরা উল্লসিত, এর ফলে সাধারণ মানুষের সঞ্চয়কে তারা বেশি বেশি করে নিজেদের শিল্প, কোম্পানি বা সংস্থার কাজে লাগাতে পারবে।

পাঁচের পাতায় দেখুন

শাসক বদলায়, নগর-যন্ত্রণা নয়

নাগরিক দাবিতে সোচ্চার এসইউসিআই(সি) প্রার্থীরা

কলকাতা পুরসভা নির্বাচন

১৯ ডিসেম্বর কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন। এই নর্বাচনে এসইউসিআই (সি) ২০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। পুরসভা নির্বাচনের ঘোষণা হতেই আবারও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির জোয়ারে ভাসছে কলকাতা। অথচ মাত্র কিছুদিন আগেই শহর ভাসছিল বৃষ্টির জমা জলে। দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই মেট্রোপলিটন শহরের বুকে খোলা ম্যানহোলে পড়ে মানুষের মৃত্যুর ঘটনাও বিরল নয়। কোনও সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই ম্যানহোল পরিষ্কার করতে গিয়ে কর্মীদের মৃত্যু হচ্ছে বারবার। বেশ কয়েকটি বরোয় আজও খোলা নর্দমার পাঁক, পুতিগন্ধময় খালের দুর্গন্ধ সহ্য করেই জীবন অতিবাহিত হয় নাগরিকদের। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রতিটি ওয়ার্ডেই পানীয় জলের সমস্যা লেগেই আছে। বেশ কিছু ওয়ার্ডে পানীয় জল কিনে খাওয়াটাই নাগরিকদের কাছে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। কারণ, পুরসভার সরবরাহ করা জল থেকে আন্ত্রিক, জন্ডিস ইত্যাদি জলবাহিত রোগ না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। স্বাধীনতার আগে পলতা এবং টালা জলপ্রকল্প তৈরি করে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার যে পরিমাণ পানীয় জল উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছিল তারপর কংগ্রেস, সিপিএম এবং বর্তমান তৃণমূল পরিচালিত পুরসভা তার সাথে যোগ করেছে খুবই সামান্য পরিমাণ। দূষিত বাতাস, গাড়ির ধোঁয়া, ধুলোয় বাড়ছে নানা রোগের আক্রমণ। *সাতের পাতায় দেখুন*

সংসদে বাতিল হল কৃষি আইন

কৃষকদের সংগ্রামী অভিনন্দন

২৯ নভেম্বর পার্লামেন্টে বাতিল হল কর্পোরেট স্বার্থবাহী তিন কালা কৃষি আইন। সংযুক্ত কিসান মোর্চার নেতৃত্বে সাধারণ কৃষকদের বর্ষব্যাপী বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের এ এক বিরাট জয়। এই জয় অর্জনের জন্য প্রায় সাতশো কৃষককে প্রাণ দিতে হয়েছে। আমরা এই শহিদদের ও সংগ্রামী কৃষকদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। জয়ের পরই এক বিবৃতিতে এ কথা জানান এ আই কে কে এম এস-এর সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান এবং সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ। তাঁরা বলেন, এই জয় থেকে শিক্ষা নিয়ে বিদ্যুৎ বিল বাতিল এবং এমএসপি আইনসিদ্ধ করার দাবিতে আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য কৃষকদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

রাজ্যে এসএসসি -তে নিয়োগ দুর্নীতির প্রতিবাদে ২৯ নভেম্বর এআইডিএসও এআইডিওয়াইও-র বিক্ষোভ মিছিল কলেজ স্ট্রিটে। এসএসসি-র চেয়ারম্যানের কুশপুতুল পোড়ানো হয়।

ডেউচা-পাঁচামি ঃ আগেই চাই ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন

বীরভূমের ডেউচা-পাঁচামিতে কয়লা খনির কাজ শুরুর আগে ক্ষতিপূরণ ও পূনর্বাসন সহ ৬ দফা সুনির্দিষ্ট দাবিতে ২৯ নভেম্বর এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে জেলাশাসককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জেলা সম্পাদক মদন ঘটকের নেতৃত্বে ৪ জনের প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের সাথে আলোচনায় অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা করে পুনর্বাসনের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। কমরেড ঘটক জেলাশাসককে বলেন, জোর করে অধিগ্রহণ হলে এলাকাবাসী তা মেনে নেবে না।

ডেউচা-পাঁচামি এলাকায় প্রায় ১২০০ ফুট নিচে উৎকৃষ্ট কয়লা এবং তার উপরের অংশে উন্নতমানের ব্যাসল্টের সন্ধান অনেক দিন আগেই পাওয়া গেছে। এই বিপুল পরিমাণ খনিজ সম্পদ উত্তোলন করার কথা সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। এর ফলে যুগপৎ আশা এবং আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে। একদিকে যেমন এলাকার উন্নয়ন, মানুষের কাজ পাওয়ার বিষয়টি রয়েছে, অন্যদিকে ওই এলাকায় যাদের ঘরবাড়ি, চাষবাস এবং পাথর খাদানে যে হাজার হাজার মানুষ জীবিকা নির্বাহ করেন তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে উচ্ছেদের প্রবল আশঙ্কা। আশঙ্কা এই কারণে যে, সর্বস্ব হারিয়ে আগামী দিনে কীভাবে বাঁচবেন। কেন না, তিক্ত অভিজ্ঞতায় তাঁরা জানেন, সরকারি প্রচার এবং বাস্তবের মধ্যে যেমন বিরাট পার্থক্য থাকে তেমনই থাকে দলবাজি, স্বজনপোষণ আর ভয়াবহ দুর্নীতি।

ছয়ের পাতায় দেখুন

অনলাইন শিক্ষা

শিক্ষা গৌণ, মুখ্য মুনাফাই

জনজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও গুরুতর আঘাত হেনেছে করোনা অতিমারি। প্রায় দেড় বছর পর স্কুল-কলেজ খুলেছে। অভিজ্ঞতা বলছে, ইতিমধ্যে স্কুল ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার বিরাট ক্ষতি হয়ে গেছে। বহু শিশুরই পড়ার এবং লেখার অভ্যাস হারিয়ে গেছে। স্কুলছুট হয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে।

এই সময়টাতে যে অনলাইন শিক্ষাকে পদ্ধতিগত শিক্ষার বিকল্প হিসাবে তুলে ধরার জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকার উঠেপড়ে লেগেছিল, তার ফলাফল কী হয়েছে? একটি সর্বভারতীয় সমীক্ষা দেখিয়েছে, শহরে অনলাইন ক্লাস নিয়মিত করতে পেরেছে ২৪ শতাংশ ছাত্র আর গ্রামে এই সংখ্যা হল মাত্র ৮ শতাংশ। শহরে ১৯ শতাংশ ও গ্রামে ৩৭ শতাংশ ছাত্র স্থায়ীভাবে পড়াশোনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

ক্লাসরুম ভিত্তিক শিক্ষা চালুর দাবিতে এআইডিএসও রাজ্য জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। আন্দোলন ভাঙতে রাজ্য সরকার আন্দোলনকারীদের উপর বর্বরোচিত পুলিশি নির্যাতন নামিয়ে এনেছিল শুধু কেন্দ্রীয় সরকার নয়, এ রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারও শিক্ষাব্যবস্থাটিকে অনলাইন নির্ভর করতে উদ্যোগী। অথচ এর জন্য শিক্ষকদের কোনও প্রশিক্ষণ, ছাত্র এবং শিক্ষকের কাছে বিনামূল্যে অবিচ্ছিন্ন নেটওয়ার্ক সরবরাহ ইত্যাদি পরিকাঠামোগত কোনও ব্যবস্থা কোনও সরকারই করেনি। ফলে ইন্টারনেটের টাকা জোগাড় করতে না পারা, দীর্ঘক্ষণ ক্লাসে শিক্ষকদের অনুপস্থিতি, বারেবারে ডিভাইসের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, অনলাইন কন্টেন্ট তৈরি করতে না পারা প্রভৃতি সমস্যাগুলি সামনে এসেছে।

দুয়ের পাতায় দেখুন

অনলাইন শিক্ষা

একের পাতার পর

ছাত্রদের ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলাকায় নেটওয়ার্কের সমস্যা, ছাত্রদের হাতে স্মার্টফোনের মতো কোনও ডিজিটাল যন্ত্র না থাকা, ঘরে ক্লাসের পরিবেশ না থাকায় মনোযোগ দিতে না পারা বা অন্য কাজে যুক্ত থাকা, পরীক্ষার উত্তরপত্র ও হোমওয়ার্ক ঠিকমতো জমা দিতে না পারা প্রভৃতি সমস্যাগুলি লক্ষ করা যাচ্ছে। পরিণতিতে শিক্ষকরা যেমন তাদের রুটিন ক্লাস করাতে পারেননি, তেমনি ছাত্ররাও ক্রমাগত পঠন-পাঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এ দেশের বেশিরভাগ মানুষেরই অনলাইন শিক্ষার জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, হাইস্পিড ইন্টারনেট কানেকশন নেই। ক্লাস করার মতো নির্জন ঘরও বেশিরভাগ পরিবারের নেই তা জানা সত্ত্বেও সরকার অনলাইন ক্লাসের উপর নির্ভর করেছিল। এতেই স্পষ্ট যে, সরকার সমাজের সব স্তরের ছাত্রছাত্রীদের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া নিয়ে আদৌ চিন্তিত নয়। সমীক্ষাতে দেখা যাচ্ছে, যতটুকু অনলাইন শিক্ষা চালু হয়েছে, তার সুযোগ নিতে পেরেছে শুধু আর্থিকভাবে সচ্ছল ছাত্ররা। আর অসচ্ছলরা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়েছে যা আমাদের দেশ তথা শিক্ষাক্ষেত্রে থাকা বৈষম্যকে আরও প্রকট করেছে। 'ডিজিটাল ডিসক্রিমিনেশন' শব্দটি এখন ভালো মতোই চালু হয়ে গেছে।

দু'বছরের করোনা অতিমারি ও লকডাউনের সময়ে অস্বাভাবিক দ্রুততায় কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ নিয়ে এসেছে। এ জন্য সাধারণ মানুষ, শিক্ষাবিদ, অভিভাবক, শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠনগুলির মতামত সরকার শোনেইনি। কেবল বিজেপির তাঁবেদার শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠনের মতামত নিয়ে এবং আরএসএস-এর নির্দেশিকা ও দাবি মেনে, সংসদে তর্ক-বিতর্কের কোনও সুযোগ না দিয়ে তারা এই নীতি দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। এই নীতিতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে অত্যন্ত জোর দিয়ে 'অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা'র কথা বলা হয়েছে যা লকডাউনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ থাকার সুযোগে দ্রুত কার্যকর করতে সরকার সক্রিয়। বাস্তবে অতিমারির প্রকোপ শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই অনলাইন শিক্ষা চালু করা সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল। অতিমারি ও লকডাউন এ কাজে তাদের সুবিধা করে দিয়েছে।

সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অন্যান্য পরিষেবা ক্ষেত্রগুলির মতোই শিক্ষাও একটি ব্যবসায়িক পণ্য, যার একমাত্র লক্ষ্য মুনাফা লুঠ। ফলে, ন্যূনতম পরিকাঠামো, কম শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতির মাধ্যমে কম বিনিয়োগে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনে পুঁজিপতিদের সুযোগ করে দেওয়াই জাতীয় শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য। অনলাইন শিক্ষা চালু করে ল্যাপটপ, স্মার্টফোন বিক্রি সহ ইন্টারনেট কানেকশন, বিভিন্ন অ্যাপ বিক্রি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে একদল শিল্পমালিককে বিপুল মুনাফা অর্জনের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এদেরই কয়েকজন লকডাউনের মধ্যেই শত-কোটিপতির তালিকায় নাম তুলে ফেলেছেন।

অনলাইন ক্লাস ছাড়াও টেলিভিশন, রেডিও ও ফোনে ক্লাস চালু করা হয়েছিল। এ সবে যে শিক্ষার প্রহসনই শুধু হয়, সেটা অভিভাবকরা অভিজ্ঞতায় বুঝেছেন। ফলে পরিবারের শত অভাবের মধ্যেও গ্রাম-শহরে ছাত্রছাত্রীদের টিউশন নিতে ছুটতে হয়েছে। খরচের নতুন বোঝা চেপেছে অভিভাবকদের কাঁধে। তাছাড়া, দীর্ঘ অতিমারিতে কোটি কোটি মানুষ কর্মহীন, পরিবারগুলির আয় প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খেয়েছে। এই অবস্থায় যখন মানুষ দু'বেলা দু'মুঠো অন্নসংস্থান করতেই হিমসিম খাচ্ছে, তখন তাদের পক্ষে স্মার্টফোন, হাইস্পিড ইন্টারনেট প্রভৃতির ব্যবস্থা করাটা কতখানি অসম্ভব, তা কি সরকারগুলি জানে না! সমীক্ষা দেখাচ্ছে, দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিন চতুর্থাংশ গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত। এই বিদ্যালয়গুলির ছাত্ররা প্রায় পুরোপুরি শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

অনলাইন শিক্ষায় আরেকটি সমস্যাও উঠে এসেছে। দেখা যাচ্ছে, কারিগরি শিক্ষার মতো ল্যাবরেটরি, ওয়ার্কশপ, প্রজেক্ট ও প্র্যাকটিক্যাল নির্ভর বিষয়গুলির পঠন-পাঠন কোনও মতেই অনলাইনে সম্ভব নয়। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষা অনলাইনে পরিচালিত হওয়ায় ল্যাবরেটরি বা ওয়ার্কশপের সাথে যে আপস করা হচ্ছে, তা ডেকে আনছে ওই ক্ষেত্রগুলিতে শিক্ষার নিম্ন মান। অনলাইন কারিগরি শিক্ষার বেহাল চিত্র আজ বিশ্ব জুড়েই।

আরও একটি আশঙ্কা সামনে এসেছে। তা হল, অনলাইন শিক্ষায় এত গুরুত্ব দিলে ভবিষ্যতে শিক্ষক নিয়োগ গুরুত্বহীন হয়ে যাবে না তো!

অনলাইন শিক্ষা যে প্রথাগত ক্লাসরুম শিক্ষার বিকল্প হতে পারে না, সেই বিষয়টিও সামনে এসেছে। এই পদ্ধতিতে ছাত্রদের সামগ্রিক বিকাশ ও পড়াশোনার অভ্যাস যে ব্যাহত হচ্ছে, তা কয়েকটি গবেষণায় ও সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমতে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অনলাইনে সরাসরি পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা না থাকায় ক্লাসরুম শিক্ষার যে গভীরতা ও কার্যকারিতা থাকে তা এখানে অনুপস্থিত। সরাসরি ছাত্রদের সংস্পর্শে না আসার ফলে শিক্ষক বুঝতেই পারছেন না একজন ছাত্র কী বুঝছে বা আদৌ সে বুঝতে পারছে কি না। ক্লাসরুম শিক্ষার যৌথ পরিবেশ, সহপাঠীদের সাথে সম্পর্ক ও আবেগ, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, মতবিনিময়, একত্রে খেলাধূলা করা, কমন রুম, সেমিনার হল প্রভৃতি যে বিষয়গুলি একজন ছাত্র পায় এবং যা তার সার্বিক বৌদ্ধিক ও মানসিক বিকাশে এবং সামাজিক মনন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা অনলাইনে আদৌ সম্ভব নয়। কিছুদিন আগে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এক পর্যবেক্ষণে জানিয়েছেন যে, অনলাইন শিক্ষা দেশের মধ্যে সুবিধাভোগী ও সুবিধাবঞ্চিত— এই দুই ভাগে ছাত্রসমাজকে ভাগ করে দিয়েছে। তিনি সকলের হাতে মোবাইল ও ট্যাব তুলে দেওয়ার ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর বন্দোবস্ত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের দেশে কোনও সরকারই যে এই নির্দেশ কার্যকর করবে না, তা এতদিনের অভিজ্ঞতায় স্পষ্ট। যুক্তির খাতিরে যদি ধরে নেওয়াও হয়, সরকার মোবাইল ও ট্যাব ছাত্রদের দেবে তা হলেও যে অনলাইন শিক্ষা ক্লাসরুম শিক্ষার বিকল্প হতে পারে না, শুধুমাত্র কিছুটা সহায়তা করতে পারে, তা পূর্বেই প্রমাণিত। ফলে এটা স্পষ্ট, এসব কিছু সত্ত্বেও যে সরকারগুলি অনলাইন শিক্ষায় এত গুরুত্ব দিচ্ছে, তার কারণ যে পুঁজিপতিদের সমর্থন এবং আর্থিক সহায়তায় তারা সরকারে বসেছে, অনলাইন সামগ্রীর ব্যবসায় তাদের মুনাফার ব্যবস্থা করে দেওয়া। শিক্ষার মান যতই নামুক, শিক্ষা বেচে কর্পোরেট কোম্পানির মুনাফার বন্দোবস্ত করা। জনশিক্ষার লক্ষ্য সেখানে গৌণ।

ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সহ সকল মানুষের ঐক্যবদ্ধ সোচ্চার দাবিই পারে অবিলম্বে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিয়ে শিক্ষার স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে চালু করতে।

জীবনাবসান

মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্বতন জেলা কমিটির সদস্য ও ডোমকল লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড মোশারফ হোসেন ১৫ নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। বহু সাধারণ মানুষ এবং দলের কর্মী-সমর্থকরা তাঁর বাড়িতে গিয়ে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষাল এবং জেলা সম্পাদক কমরেড সাধন রায়ের পক্ষে মাল্যদান করা হয়। জেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও লোকাল কমিটির পক্ষেও নেতা-কর্মীরা মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

কমরেড মোশারফ হোসেন ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে কমরেড প্রভাস ঘোষের আলোচনা শুনে আকৃষ্ট হন এবং নজরুল সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন। কলেজের পড়াশোনা শেষ করে তৎকালীন জেলা সম্পাদক প্রয়াত কমরেড মাধব রায়চৌধুরীর আলোচনা শুনে দলের সঙ্গে যুক্ত হন এবং ডোমকলে দলের সংগঠন গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। শিক্ষক হিসেবে তিনি পেশাগত ও শিক্ষার নানা দাবি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন। এর মধ্য দিয়ে জেলার শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতায় পরিণত হন। তিনি দলের শিক্ষক ফ্রন্টের জেলা ইনচার্জের দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে পালন করেন।

ডোমকল থানা এলাকায় যুবকদের সংগঠিত করা সহ বেনাম জমি উদ্ধারে গরিব মানুষকে সংগঠিত করে গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। এই সময় পাট্টা বিলিকে কেন্দ্র করে সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতী বাহিনীর আক্রমণে তিনি এবং দলের অনেক কর্মী আহত হন। এই আন্দোলনে তাঁদের জয় হয়। গরিব অসহায় তাঁত শিল্পীদের সংগঠিত করে তিনি মহাজনদের শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি আন্দোলনও তিনি গড়ে তোলেন এবং দাবি আদায় করেন। মজে যাওয়া শিয়ালমারি নদী সংস্কার করার আন্দোলনে তিনি ব্যাপক মানুষকে সামিল করেন। এই আন্দোলন ভাঙতে ব্যাপক পুলিশি আক্রমণ নেমে আসে। তাঁর দরদি মন এবং সুমিষ্ট ব্যবহার আপামর জনসাধারণ এবং দলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করত। যার জন্য তিনি সকলের আপনজন হয়ে উঠেছিলেন।

সেরিব্রাল স্ট্রোকে দীর্ঘ কয়েক বছর অসুস্থ ছিলেন, এমনকি তিনি কথাও বলতে পারতেন না। দীর্ঘ চিকিৎসার পর সুস্থ হলে আবারও দলের কাজ শুরু করেন। ওই বয়সেও ডোমকলে দলের মুখপত্র গণদাবী বিক্রিতে ও কর্মসূচি রূপায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। তিনি আমৃত্যু দলীয় চিন্তা ও আদর্শ নিয়ে চলার চেষ্টা করেছেন।

দ্বিতীয়বার সেরিব্রাল স্ট্রোকের আগের রাতে দলের লোকাল সম্পাদককে দলের চাঁদা, ডোমকল পার্টি অফিস ফান্ড সহ অন্যান্য দেয় টাকা নিয়ে যাওয়ার কথা ফোনে বলেন। সেই রাত্রেই তিনি অসুস্থ হন এবং এবং কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে ১৫ নভেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন অভিভাবককে এবং এলাকার মানুষ হারাল তাদের অত্যন্ত আপনজনকে।

কমরেড মোশারফ হোসেন লাল সেলাম

২৬ নভেম্বর রাজ্য জুড়ে কৃষক আন্দোলনে সংহতি জ্ঞাপন

দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের জয়কে অভিনন্দন জানিয়ে ২৬ নভেম্বর কৃষক আন্দোলনের বর্ষপূর্তিতে বহরমপুরে এ আই কে কে এম এস-এর নেতৃত্বে সহস্রাধিক কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের সুসজ্জিত মিছিল ও সমাবেশ হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সাধন রায়, সংগঠনের জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড মনিরুল ইসলাম, সভাপতি কমরেড অমল ঘোষ ও রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি কমরেড মদন সরকার সহ নেতৃবৃন্দ।

কোচবিহার শহরে এআইকেকেএমএসের পক্ষ থেকে মিছিল ক্ষুদিরাম স্কোয়ারে শুরু হয়ে রাজা রামমোহন স্কোয়ারে শেষ হয়। নেতৃত্ব দেন দলের জেলা সম্পাদক শিশির সরকার, নেপাল মিত্র, নৃপেন কার্যি, সংগঠনের কোচবিহার জেলা সম্পাদক মানিক বর্মন প্রমুখ।

এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে এ দিন দেশ জুড়ে কৃষক-ছাত্র সংহতি দিবস পালিত হয়। শিক্ষায় বেসরকারিকরণের নীলনকশা জাতীয় শিক্ষানীতি প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এ দিন ঐতিহাসিক এই কৃষক আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে শহিদ বেদি স্থাপন করে মাল্যদান কর্মসূচি ও সভা হয়।

এআইএমএসএসের পক্ষ থেকে ২৩ নভেম্বর রাজ্য জুড়ে বিজয় মিছিল, পথসভা, জাঠা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ২৬ নভেম্বর সংযুক্ত কিসান মোর্চা ও কেকেএমএস-এর কর্মসূচিতে সর্বত্র সংগঠন অংশগ্রহণ করে।

নাগরিকদেরই তবে ভয় পাচ্ছে বিজেপি সরকার

কোনও রাখঢাক না করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হল নাগরিক সমাজই কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের প্রধান শত্রু। সরকারের যুদ্ধটা এখন তাদের বিরুদ্ধেই— স্পষ্ট বললেন কেন্দ্রীয় সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল।

দেশের মানুষ জানে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাথে ভারতে যে ব্যক্তিটি এখন একচ্ছত্র ক্ষমতা ভোগ করেন তাঁর নাম অজিত ডোভাল। তিনি যখন বলে দিয়েছেন, বুঝতে হবে এটাই আসলে কেন্দ্রীয় সরকারের 'মন কি বাত'।

১১ নভেম্বর হায়দরাবাদে জাতীয় পুলিশ অ্যাকাডেমির 'পাসিং আউট প্যারেডে' সদ্য পাশ করা আইপিএসদের কর্তব্য নির্ধারণ করে এই বার্তাই দিয়ে এসেছেন ডোভাল। বলেছেন, নাগরিক সমাজই সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তি ও বিকৃতির শিকার হয়ে জাতীয় স্বার্থবিরোধী শক্তিতে পরিণত হয়। জাতীয় স্বার্থ কোনগুলো তিনি অবশ্য তা খোলসা করে বলেননি। গত অক্টোবরে এক সভায় প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, কিছু লোক মানবাধিকারের কথা তুলে দেশের ভাবমূর্তিতে কালি ছেটাচ্ছে। তিনি গত ফেব্রুয়ারি মাসে আইনজীবী, কৃষক, ছাত্র সকল স্তরের আন্দোলনকারীদের 'আন্দোলনজীবী' বলে কটাক্ষ করেছেন। বিজেপি নেতারা কৃষক আন্দোলনকারীদের আখ্যা দিয়েছিলেন 'টুকরে টুকরে গ্যাং', 'খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদী' ইত্যাদি। গত কয়েক বছর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলে চলেছেন, মানবাধিকার সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং বুদ্ধিজীবীরা (যাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন) বিদেশের টাকায় চলছেন। কৃষক আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোর অপরাধে পরিবেশ কর্মী, সমাজকর্মী, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা দিল্লি পুলিশ এবং অন্যান্য রাজ্যের বিজেপি সরকার। বোঝা যাচ্ছে নিরাপত্তা উপদেষ্টা তাঁর উপদেশের ঝুলি এইসব মণি-মুক্তোতেই ভরেছেন এবং এক পা এগিয়ে নাগরিককেই শত্রু হিসাবে দেগে দিয়েছেন।

নাগরিক সমাজ বলতে সাধারণ ভাবে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, সমাজকর্মী, পরিবেশবিদ, বিজ্ঞানীদের, অর্থাৎ সমাজের চিন্তাশীল অংশটিকে বোঝানো হয়। কংগ্রেসের মনমোহন সিং সরকারের আমলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দিল্লিতে আন্না হাজারের আন্দোলনে এই অংশের মানুষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামের জমি রক্ষার আন্দোলনের সময় প্রতিবাদী কৃষকদের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল সমাজের এই অংশটি। বিজেপি ঘনিষ্ঠ ধর্মোন্মাদদের হাতে প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকদের হত্যা ও গো-রক্ষার নামে সংঘবদ্ধ নরহত্যার বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে খেতাব এবং পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয়েছিল শিল্পী-সাহিত্যিকদের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। বিজেপি সরকারের আনা সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সারা ভারতের সবচেয়ে অগ্রণী শিক্ষাবিদ বিজ্ঞানীরা রুখে দাঁড়ানোর কথা জানিয়ে দিয়েছেন। দেশের শিক্ষিত, সচেতন এই অংশটি যাঁরা বিজেপির সাম্প্রদায়িক, স্বৈরাচারী, জনস্বার্থবিরোধী রাজনীতির বিরুদ্ধে কথা বলছেন, তাঁদেরই দেশের শত্রু হিসাবে দাগিয়ে দিচ্ছে বিজেপি সরকার।

দেখা যাচ্ছে, বিজেপির এই বিষাক্ত রাজনীতি মানতে রাজি নয় গোটা দেশের সাধারণ মানুষ। সিএএ বিরোধী আন্দোলন, দিল্লি সীমান্তের কৃষক আন্দোলন প্রমাণ করেছে, 'নাগরিক সমাজ'-এর সংজ্ঞা

শাহিনবাগ কিংবা দিল্লির কৃষক আন্দোলন দেখিয়ে দিয়েছে ভোটসর্বস্ব বড় দলগুলির সাহায্য ছাড়াও সচেতন সংঘবদ্ধ নাগরিকরা একটা চরম উদ্ধত সরকারেরও মাথা কী ভাবে নত করে দিতে পারে। বিজেপি সরকারের আতঙ্ক এখানেই।

এখন আর জনসাধারণের একটি অংশে সীমাবদ্ধ নেই। আন্দোলনকারীদের ঐক্যবদ্ধ সচেতন বুদ্ধিদীপ্ত সংগ্রাম ও তার প্রতি প্রবল জনসমর্থন বুঝিয়ে দিয়েছে, গোটা দেশের সমগ্র প্রতিবাদী জনতাই আজ 'নাগরিক সমাজ'। শাহিনবাগ কিংবা দিল্লির কৃষক আন্দোলন দেখিয়ে দিয়েছে ভোটসর্বস্ব বড় দলগুলির সাহায্য ছাড়াও সচেতন সংঘবদ্ধ নাগরিকরা একটা চরম উদ্ধত সরকারেরও মাথা কী ভাবে নত করে দিতে পারে। বিজেপি সরকারের আতঙ্ক এখানেই। কারণ, এই সরকারের কাছে সম্প্রীতি নয়, সাম্প্রদায়িক বিভাজনই জাতীয় স্বার্থ। কোটি কোটি শ্রমজীবীর স্বার্থ তাদের কাছে জাতীয় স্বার্থ নয়, মুষ্টিমেয় মালিকের স্বার্থই বিজেপি নেতাদের কাছে জাতীয় স্বার্থ। সেই কারণেই কৃষি আইনের মতোই নতুন শ্রম আইন এনেছে তারা।

বিজেপি সরকারের আমলে দেশে কার্যত চলছে অঘোষিত জরুরি অবস্থা। সামরিক বাহিনী, পুলিশ, জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা (এনআইএ) এই বাহিনীগুলিই যেন হয়ে উঠছে দেশের যে কোনও বিষয়ে কথা বলা এবং যথেচ্ছ ক্ষমতা ভোগ করার অধিকারী। সিবিআই, ইডি-র মতো তদন্তকারী সংস্থা সমস্ত নিরপেক্ষতা হারিয়ে শাসকদলের দপ্তরে পরিণত হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে আজ সংসদের ভূমিকাও প্রায় নস্যাৎ করে দিচ্ছে এই সরকার। সরকার জানে এই স্বৈরাচার এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা যে আক্রমণ নামিয়ে আনছে তার বিরুদ্ধে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের পাশাপাশি চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীদের শক্তি যুক্ত হলে প্রতিবাদের শক্তি বর্ধিত হবে বহুগুণ। সরকার এ-ও জানে বর্তমান তীব্র সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে যত একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা তাদের মুনাফাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে শোষণ আরও তীব্র করবে, তত সঙ্কটের অতল খাদের দিকে চলে যাবে দেশের খেটে খাওয়া মানুষ। প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলি পুঁজির স্বার্থরক্ষায় আরও বেশি বেআব্রু হয়ে পড়বে। এবং ততই সাধারণ নাগরিকরা বেশি বেশি করে সংগ্রামে এগিয়ে আসবেন। এ বারের কৃষক আন্দোলনে দেখা গেছে, শুধু সরকার পরিবর্তন নয়, কৃষকদের মধ্যে থেকেই উঠে এসেছে একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই যে সমস্যার আসল কারণ তা তাঁরা ধরতে শুরু করেছেন। পুঁজিপতিদের বিশ্বস্ত সেবাদাস হিসাবে বিজেপি সরকার তাতেই বেশি চিন্তিত। স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের মোকাবিলা রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে বড় সমস্যা নয়। কিন্তু তাতে চেতনার স্পর্শের সম্ভাবনাতেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার রক্ষকরা আতঙ্কিত। তাই তারা নাগরিক সমাজকেই এখন আক্রমণের মূল লক্ষ্যে পরিণত করেছে।

এ জিনিস অতীতেও বারবার দেখা গেছে। কংগ্রেস সরকারের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করে নাগরিক সংগঠনগুলোকে বিদেশি শক্তির মদত জোগানোর অভিযোগ করতেন। শাসকের গদিতে বসলে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণিকে রক্ষা করার তাগিদ এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে যে, তথাকথিত বামপন্থী নেতা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও বলেছিলেন, 'মানবাধিকার-ফানবাধিকার আমি বুঝে নেব'। সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় পশ্চিমবঙ্গের অগ্রণী নাগরিক সমাজকে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের প্রশাসন ও শাসকদল বারবার আক্রমণ করেছে। আজ তৃণমূল কংগ্রেস সরকারও পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবাদী নাগরিক সমাজকে দমাতে বারবার পুলিশকে ব্যবহার করেছে। আসলে, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিকরা যতক্ষণ জনবিচ্ছিন্ন তথাকথিত বিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করেন ততক্ষণ শাসকের অসুবিধা থাকে না। তাদের পুরস্কার দিয়ে, কর্পোরেট মাধ্যমের আনুকূল্য দিয়ে ভরিয়ে রাখেন তাঁরা। কিন্তু সাধারণ মানুষের লড়াই-আন্দোলনের পাশে দাঁড়ালেই বুদ্ধিজীবীরা দেশের শত্রু বনে যান।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার গায়ে দিনে দিনে সার্বিকভাবে স্বৈরাচারী, ফ্যাসিস্ট চরিত্রলক্ষণ প্রকটভাবে ফুটে বেরোচ্ছে। শাসক বুর্জোয়া শ্রেণির সেবাদাস হিসাবে শাসকদলগুলিও যে কোনও প্রতিবাদকেই গলা টিপে মারতে কোমর বেঁধে নামছে। শাসক বিজেপি একচেটিয়া পুঁজির সেবাদাস হিসাবে এই কাজ করে চলেছে। তাই সামগ্রিকভাবে সমস্ত সচেতন সংগ্রামী নাগরিকই আজ আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। নাগরিক সমাজের প্রতিবাদী কণ্ঠ রোধ করার এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সমস্ত স্তরের মানুষকে প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়ণে ইউজিসি-র তৎপরতার বিরুদ্ধে

৮ ডিসেম্বর দেশজুড়ে বিক্ষোভ দেখাবে সেভ এডুকেশন কমিটি

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ কার্যকর করার জন্য উপাচার্যদের নামাতে চলেছে মোদি সরকার। এই উদ্দেশ্যে ইউজিসি-কে দিয়ে সম্প্রতি এক সার্কুলার জারি করা হয়েছে। ইউজিসি-র চেয়ারম্যান ডি পি সিং নির্দেশিকায় বলেছেন, জাতীয় শিক্ষানীতি দ্রুত কার্যকর করার জন্য অবিলম্বে 'ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি সেল' (নেপসেল) গঠন করতে হবে।

সরকারের এই ভূমিকার তীব্র বিরোধিতা করেছে অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি। কমিটির সম্পাদক এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তরুণ নস্কর বলেন, 'ইউজিসি-র মতো স্বশাসিত সংস্থা কোনও দিনই এমন নগ্নভাবে সরকারের নীতির পক্ষে নির্দেশ জারি করেনি।' তিনি আরও বলেন, 'এই নীতির মাধ্যমে শিক্ষা তথা উচ্চশিক্ষা অনলাইন ভিত্তিক হবে। দরজা খুলবে শিক্ষার কর্পোরেটাইজেশনের। শিক্ষা চলে যাবে উচ্চবিত্তদের কাছে।' তিনি বলেন, একে যে কোনও মূল্যেই হোক প্রতিরোধ করতে হবে। আগামী ৮ ডিসেম্বর এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী শিক্ষক-অভিভাবক-ছাত্ররা সেভ এডুকেশন কমিটির ডাকে বিক্ষোভ অবস্থানে সামিল হবে।

বাঁচার মতো মজুরির দাবিতে ট্যাক্স আদায়কারীদের বিক্ষোভ

এ রাজ্যের পঞ্চায়েত ট্যাক্স আদায়কারীদের সাম্মানিক ভাতা মাসে মাত্র ৭৫০ টাকা। এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁরা সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃত্বে আন্দোলন করে আসছেন। ২২ নভেম্বর সল্টলেকে পঞ্চায়েত ভবনে তাঁরা

ডেপুটেশন দিতে এসেছিলেন। বেতন বঞ্চনার অবসান সহ অন্যতম দাবি ছিল রেজিস্ট্রেশন রিনিউয়াল। এ দিন তাঁদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং ৬৯ জনকে গ্রেপ্তার করে। এআইইউটিইউসির রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস এক বিবৃতিতে এই পুলিশি লাঠিচার্জের তীব্র নিন্দা করেছেন।

‘এমএসপি আইনসিদ্ধ করার দাবিতে আন্দোলন জোরদার করুন’

কিসান মোর্চার কাছে প্রস্তাব এ আই কে কে এম এস-এর

দীর্ঘ আন্দোলনের জেরে তিন কালা কৃষি আইন বাতিল ঘোষিত হয়েছে। এই অবস্থায় সংগ্রামী কৃষকদের করণীয় কী? আন্দোলন প্রত্যাহার করা, নাকি অপূরিত দাবিগুলি পূরণের জন্য আন্দোলনকে বৃহত্তর রূপ দেওয়া? সংযুক্ত কিসান মোর্চার অন্যতম সদস্য এ আই কে কে এম এস এ বিষয়ে তার লিখিত বক্তব্য মোর্চার নেতৃবৃন্দকে জানিয়েছেন। সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান এবং সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ তাতে বলেছেন, ২৪ নভেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে বলা হয়েছে, সংসদের আসন্ন অধিবেশনে বিদ্যুৎ বিল (সংশোধনী)-২০২১ পেশ করা হবে। উদ্বেগের বিষয় হল, এই বৈঠকে এমএসপি আইনসম্মত করা এবং সরকারি সংগ্রহ করা নিয়ে মন্ত্রিসভা একটি কথাও বলেনি। অথচ এই দুটি কৃষক আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবি। বিদ্যুৎ বিল (সংশোধনী)-২০২১ শুধু কৃষকদের উপরেই মারাত্মক আক্রমণ নয়, সারা দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ এতে বিপন্ন হবে। একে প্রতিরোধ করা এই আন্দোলনের অবশ্য করণীয়।

২৬ নভেম্বর কৃষক আন্দোলনের বর্ষপূর্তির দিনে গাজিপুর বর্ডারে এআইকেকেএমএস সভাপতি কমরেড সত্যবান ও সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষের নেতৃত্বে মিছিল

কমরেড সত্যবান ও কমরেড শঙ্কর ঘোষ বলেন, আজকের প্রধানমন্ত্রী ২০১১ সালে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন এমএসপি আইনসিদ্ধ করার জন্য একটি কমিটি গড়েছিলেন। ২০০৪-২০০৬ সালে স্বামীনাথনের নেতৃত্বে সরকার-নিয়োজিত যে ফার্মার্স কমিশন গঠিত হয়েছিল, তারও সুপারিশ ছিল উৎপাদন ব্যয়ের উপর ৫০ শতাংশ লাভ যোগ করে কৃষিপণ্যের দাম ধার্য করা। ২০১৪ সালে বিজেপি নির্বাচনী ইস্তাহারেও এমএসপি আইনসিদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ক্ষমতায় আসার পর ৭ বছর কাটিয়ে দিয়ে সব কিছুকে ‘জুমলা’ বানিয়ে প্রধানমন্ত্রী এখন বলছেন এমএসপি নিয়ে কমিটি হবে। কেন আবার কমিটির নামে কাল হরণ? এর উদ্দেশ্য জনগণকে ধোঁকা দেওয়া ছাড়া আর কী? আমাদের দাবি, সংসদের শীতকালীন অধিবেশনেই এমএসপিকে আইনসিদ্ধ করতে হবে।

আন্দোলনের আরও কয়েকটি দাবি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলি হল, ১) আন্দোলনে যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ২) সংগ্রামী কৃষকদের উপর থেকে সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করতে হবে, ৩) লখিমপুরে কৃষকহত্যার জন্য দায়ী অজয় মিশ্র টেনিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বহিষ্কার করতে হবে। কমরেড সত্যবান ও কমরেড শঙ্কর ঘোষ বলেন, এসকেএম নেতৃবৃন্দের কাছে আমাদের অনুরোধ এই দাবিগুলি দ্রুত পূরণ না হলে এই আন্দোলন শুধু চালিয়ে যাওয়া নয়, দেশব্যাপী সংগঠিত রূপে গড়ে তুলতে হবে। সেই উদ্দেশ্যেই যথাযথ কর্মসূচি নেওয়া উচিত। তাঁরা আরও বলেন, ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন বেসরকারিকরণ ও কর্পোরেটাইজেশনের বিরুদ্ধে আগামী ফেব্রুয়ারি নাগাদ দুদিন ব্যাপী সর্বভারতীয় যে ধর্মঘটের প্রস্তুতি নিচ্ছে তাকে সর্বাত্মক সমর্থন দিয়ে শ্রমিক-কৃষক ঐক্যকে শক্তিশালী করতে হবে, যাতে কর্পোরেটের স্বার্থবাহী বিজেপি সরকার তার নীতিগুলি পাল্টাতে বাধ্য হয়। তাঁরা বলেন, আমরা আনন্দের সাথে লক্ষ করছি এই আন্দোলন দেশব্যাপী সকল স্তরের মানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। ফলে সংযুক্ত কিসান মোর্চার নেতৃত্ব এই মানুষদের ঐক্যবদ্ধ এবং সংগঠিত করতে দেশব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করুন।

এই মহান কৃষক আন্দোলন জনগণের মধ্যে আন্দোলনের প্রতি গভীর আস্থা তৈরি করেছে। আন্দোলন করলে দাবি আদায় হয়, এই প্রত্যয় তৈরি হয়েছে। ভারতের জনগণ সংযুক্ত কিসান মোর্চার এই নেতৃত্বের কাছে আরও অনেক কিছু আশা করে। তারা নিশ্চিত, এই নেতৃত্ব আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে এবং পুঁজিপতি শ্রেণি ও কর্পোরেটদের এবং তার সেবাদাস বিজেপির আধিপত্যকে পরাস্ত করতে যথাযথ ভূমিকা নেবেন।

আন্দোলন কত অপূর্ব চরিত্রের জন্ম দিয়ে যায়

একটা নামী সংবাদ চ্যানেলে কৃষক আন্দোলনের ওপর একটা ডকুমেন্টারি দেখছিলাম। অনিসন্ধিৎসু সাংবাদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন আন্দোলনস্থলের আনাচে কানাচে। সেখানেই খোঁজ পান এই মায়ের। নাম মোহিনী কওর, দিল্লির বাসিন্দা, আন্দোলনের প্রথম দিন থেকে আছেন সিংঘু বর্ডারে। বয়সের ভারে মিছিল-সভার মতো কর্মসূচিগুলোতে থাকতে পারেন না বলে নিরন্তর সেলাই করে চলেন আন্দোলনকারীদের পোশাক-পাগড়ি। সগর্বে নিজেকে আন্দোলনের অংশ হিসেবেও দাবি করেন। সাংবাদিক প্রশ্ন করেন বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না? বাকিটা তাঁরই জবানিতে...

...কী করবো বাড়ি ফিরে? একটিই সন্তান ছিলো আমার, মারা গেছে। আন্দোলনরত এই মুখগুলো— সবাই আমার সন্তানের মতোই যে দেখতে। বাঘের বাচ্চা আমার এই বাছারা।

একটু থেমে ফের শুরু করেন— এই একটা বছর আমাদের কত কিছু দেখিয়েছে। কিন্তু শীতের রাতের জলকামান বলুন বা হঠাৎ তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া— কিছুতেই তো আর ভয় হয় না, একদিন তো মরবই। ... আমার এই যে বাছারা, যাদের দিন কাটতো মাখন খেয়ে, দুধে স্নান করে, তারা যখন একটার পর একটা শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা ট্রলির ওপর কাটিয়ে দিতে পারছে তখন আমার মতো মায়েদের ঘুম আসবে কী করে বলতে পারেন? মৃত্যু ছাড়া এখান থেকে আমরা কেউ নড়ছি না, আর কাপুরুষের মৃত্যু মরবই বা কেন? জয় আমাদের নিশ্চিত।

সাংবাদিক আবার প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন অশীতিপর বৃদ্ধার দিকে, তিন কালা কৃষি আইন রদ হওয়ায় আপনার প্রতিক্রিয়া কী? স্মিত হাসির সাথে জবাব আসে, সরকারকে ধন্যবাদ, তাঁরা আমাদের এক হতে বাধ্য করেছেন, আমরা কেউ আর ভিন্ন এলাকা, জেলা বা রাজ্যের বাসিন্দা নই, এক মানুষ, যারা একসাথে লড়েছি, একসাথে জিতেছি।

আন্দোলন কত অপূর্ব চরিত্রের জন্ম দিয়ে যায়। অন্তরালে থেকে যাঁরা এভাবেই সৃষ্টি করে চলেন সত্যিকারের আশা-ভালোবাসা-মাতৃত্বের!

কৃষক আন্দোলনের বর্ষপূর্তিতে অপূরিত দাবিগুলি আদায়ে দেশ জুড়ে বিক্ষোভ

আহমেদাবাদ, গুজরাট

দুরগ, ছত্তিশগড়

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

কলকাতার ধর্মতলায় বক্তব্য রাখছেন কৃষক নেতা কমরেড গোপাল বিশ্বাস

গোয়ালিয়র, মধ্যপ্রদেশ

পূর্ব বর্ধমান

রাজপথে নার্সেস ইউনিটি

বেতন বৈষম্য নিরসনের দাবিতে ও আন্দোলনরত নার্সদের অন্যায়ভাবে বদলির বিরুদ্ধে নার্সেস ইউনিটির নেতৃত্বে এস এস কে এম হাসপাতালের নার্সদের আন্দোলন ১২ নভেম্বর থেকে চলছে। চলছে রিলে অনশন। অথচ সরকারের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিনিধি আন্দোলনকারীদের সাথে দেখা করেননি। সরকারের এই ভূমিকার প্রতিবাদে ২৭ নভেম্বর ১০ হাজার নার্সিং স্টাফের এক বিশাল মিছিল এস এস কে এম থেকে শুরু হয়ে মিন্টো পার্ক-এক্সাইড মোড় হয়ে এস এস কে এম-এ এসে শেষ হয়। সংগঠনের নেত্রী ভাস্বতী মুখার্জী বলেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলবে।

এই আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রুনা পুরকাইতের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের প্রতিনিধিদল ২২ নভেম্বর অনশন মঞ্চে যান এবং বক্তব্য রাখেন।

ব্যাঙ্কের অফ সাইট এটিএম কর্মীদের বেতন কমানোর পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত কন্ট্র্যাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের উদ্যোগে কলকাতার আইডিবিআই ব্যাঙ্কের জোনাল অফিসের সামনে বিক্ষোভ। ২৫ নভেম্বর

কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে ২৯ নভেম্বর দলের প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দেন

৫১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী শ্রাবণী ব্যানার্জী

৭২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী দেবু সাউ

ইরানে নদীর পুনরুজ্জীবনের দাবিতে হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ

এ দেশে কৃষক আন্দোলনের কাছে যেদিন মাথা নোয়াতে বাধ্য হল অগণতান্ত্রিক বিজেপি সরকার, সেই ঐতিহাসিক দিন ১৯ নভেম্বরই ইরানের ইস্পাহান প্রদেশের হাজার হাজার কৃষক আন্দোলনে সামিল হলেন শুকিয়ে যাওয়া নদী জায়নদ রুদের বুকে দাঁড়িয়েই। সরকারের কাছে দাবি জানালেন নদীতে অবিলম্বে জল ফিরিয়ে দিতে হবে। আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন দেশের সর্বস্তরের মানুষ।

জায়নদ রুদ নদী ইরানের বৃহত্তম ও স্রোতস্বিনী নদী ছিল। কৃষকদের চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জলের জোগান দিত এই নদী, গত কয়েক বছরে তাতে এক ফোঁটা জল নেই। সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য জলসংকট তীব্র। নাব্যতা বাড়ানোর জন্য সরকারি পরিকল্পনার একান্ত অভাব আর বারবার গতিপথ পরিবর্তনই নদী শুকিয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। এমনিতেই ইরান খরাপ্রবণ। তার মধ্যে ইস্পাহান সহ বেশ কয়েকটি প্রদেশ এ বছর ভয়ঙ্কর খরার কবলে পড়েছে। ৯৭ শতাংশ এলাকা খরাক্লিষ্ট। হাজার হাজার কৃষকের জীবন-জীবিকা বিপন্ন, স্থানীয় মানুষ প্রবল দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন। আন্দোলনকারীরা সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন, অবিলম্বে নদীতে জল আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮ নভেম্বর থেকে টানা আন্দোলন চলছে। আন্দোলনকারীদের আশ্বস্ত করতে পূর্বতন সরকারের মতো এই সরকারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সমস্যা মেটানোর। নয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। তা খাতায়-কলমেই রয়ে গেছে। বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে আন্দোলনকারীদের কয়েক জন মারাও গেছেন। কিন্তু দাবি আদায় না হওয়ায় ১৯ নভেম্বর মজে যাওয়া ওই নদীর বুকে আবারও বিক্ষোভ দেখান হাজার হাজার মানুষ। তাদের মুখে স্লোগান ছিল 'ইস্পাহানকে শ্বাস নিতে দাও, জিয়ানদ রুদ নদী ফিরিয়ে দাও।'

হাওড়ায় শিক্ষা কনভেনশন

'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ আসলে অনেক ভালো ভালো কথার আড়ালে শিক্ষার বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও গৈরিকীকরণের নীল নকশা।' হাওড়ায় যোগেশ চন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ে ২১ নভেম্বর এক শিক্ষা কনভেনশনে এ কথা বলেন অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সহ সম্পাদক ডঃ মৃদুল দাস। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন শিক্ষক অভিজিৎ মণ্ডল। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক চণ্ডীচরণ মাইতি। অধ্যাপক বি আর প্রধানের পাঠানো বার্তার রেকর্ডিং শোনানো হয়। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন প্রধান শিক্ষিকা তনিমা মুখার্জি, গবেষক সুস্বাগত বন্দোপাধ্যায়, প্রবীর দত্ত চৌধুরী প্রমুখ। অধ্যক্ষ সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে প্রধান উপদেষ্টা, অধ্যাপক বি আর প্রধানকে সভাপতি, শিক্ষক চণ্ডীচরণ মাইতিকে সম্পাদক এবং স্নেহাশীষ দাসকে কোষাধ্যক্ষ করে হাওড়া জেলা সেভ এডুকেশন কমিটি গঠিত হয়।

ব্যাঙ্কিং বিল

একের পাতার পর

ইতিমধ্যেই অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ (এনপিএ) আকাশ ছুঁয়েছে। শিল্পপতি ধনকুবেরদের বেশিরভাগ ঋণই হয় সরকার মকুব করে দিয়েছে না হলে তা ব্যাঙ্কের খাতা থেকে মুছে দিয়েছে। এখন নিজেদের মালিকানায় থাকা ব্যাঙ্কে সাধারণের সম্পদকে ঋণের নামে কর্পোরেট মালিকরাই নিজেদের পকেটে পোরার কাজটা আরও সহজে করতে পারবেন। এর ফলে অনুৎপাদক সম্পদ আরও বাড়বে। কয়েক বছরের মধ্যে গ্লোবাল ট্রাস্ট ব্যাঙ্ক, লক্ষ্মীবিলাস ব্যাঙ্ক, ইয়েস ব্যাঙ্কের ফেল পড়ার ঘটনা এবং আইসিআইসিআইসহ অন্যান্য বেসরকারি ব্যাঙ্কের জালিয়াতি দেখিয়ে দেয় বেসরকারি হাতে তুলে দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে বাঁচানোর যুক্তিটা কতখানি অসার। ব্যাঙ্ক কর্মচারী সহ সকল স্তরের শ্রমজীবী মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, কৃষক আন্দোলনের সাফল্য থেকে প্রেরণা নিয়ে এই দানবীয় পদক্ষেপ রুখে দেওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলুন।

মানুষের নিরাপত্তা নয়, বিজেপির আধিপত্য কায়েমই উদ্দেশ্য

বিএসএফের ক্ষমতা বৃদ্ধি

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছে, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, আসামের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) এক্তিয়ার ১৫ কিলোমিটার থেকে বাড়িয়ে ৫০ কিলোমিটার করা হবে। এই এলাকার মধ্যে সরাসরি তল্লাশি, বাজেয়াপ্ত এবং গ্রেপ্তার করার অতিরিক্ত ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে বিএসএফ-এর হাতে। বিজেপি সরকারের যুক্তি, এই ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং চোরাচালান রোখা সম্ভব হবে। দেশের মানুষের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে।

এতদিন বিএসএফ ছিল, পুলিশ ছিল, কিন্তু সীমান্ত এলাকার মানুষের নিরাপত্তা কতটা সুরক্ষিত ছিল? সেখানকার মানুষের অভিজ্ঞতা হল— সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান চলে অবাধে, অথচ কাঁটাতার পেরিয়ে চাষ করতে গিয়ে বিএসএফের হাতে অত্যাচারিত হন চাষিরা। তল্লাশির নামে মহিলাদের শারীরিক নিগ্রহের শিকার হতে হয়। দিনের পর দিন গরিব মানুষের থেকে লুঠ চলে, গরু-ছাগল অবাধে পাচার হয়ে যায়। মহিলা-শিশু পাচার চলে বিএসএফের নাকের ডগায়। পাচারকারী এবং বিএসএফ চক্রের ফাঁদে পড়ে সাধারণ মানুষের অবস্থা হয়ে উঠেছে অসহনীয়। এ ছাড়াও সীমান্ত এলাকায় গুম-খুন চলে অবাধে। গত পাঁচ বছরে বিএসএফের বিরুদ্ধে ২৪০টি অত্যাচার, ৬০টি খুন এবং ৮টি নিখোঁজের ঘটনার অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে। অনথিভুক্ত সংখ্যা আরও অনেক। যখন আফস্পা সহ এই ধরনের আইনগুলি প্রত্যাহারের দাবিতে সাধারণ মানুষ সোচ্চার হচ্ছেন, তখন এ ধরনের পদক্ষেপ কি জনগণের দুর্গতি বাড়িয়ে তুলবে না?

জানা গেছে, বিএসএফের এলাকা বাড়লে ১১টি জেলা, রাজ্যের ৩৭ শতাংশ এলাকা এবং উত্তরবঙ্গের সিংহভাগ তাদের দখলে চলে যাবে। বিএসএফের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে পশ্চিমবঙ্গ ও পাঞ্জাব সরকার 'যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো'র উপর আঘাত বলে প্রতিবাদ জানিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এর বিরোধিতা করে প্রস্তাবও পাশ হয়েছে।

যে প্রশ্নটি উঠছে তা হল, সীমান্তের ১৫ কিমি-র মধ্যে বিএসএফ যদি চোরাচালান রুখতে না পারে, তাহলে ৫০ কিমি ভিতরে ঢুকে পারবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? গুজরাটে সীমান্তের ৮০ কিমি পর্যন্ত বিএসএফ-এর ক্ষমতা থাকলেও সেখানে তারা চোরাচালান রুখতে পারছে না কেন? সেখানকার মানুষের নিরাপত্তার হাল কী? সম্প্রতি গুজরাটে আদানির মুন্দ্রা বন্দরে চোরাচালান করতে গিয়ে বিপুল পরিমাণে মাদক বাজেয়াপ্ত হয়েছে, তাও বিএসএফ-এর হাতে নয়। তাহলে বিএসএফ-এর এক্তিয়ার বাড়ানোর প্রশ্ন আসছে কেন? জনবসতিপূর্ণ এলাকায় বিএসএফের অবাধ যাতায়াতের ছাড়পত্র মানুষকে ভয়ঙ্কর আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলছে। সীমান্তের দূরবর্তী এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তো পুলিশ রয়েছে। পুলিশের সাথে বিএসএফের বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই তো এ কাজ করা যায়। তা সত্ত্বেও বিএসএফ-এর ক্ষমতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত কেন? এ প্রশ্নের উত্তরও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক দেয়নি। স্বাভাবিক ভাবেই এ অভিযোগ উঠছে যে, বিরোধী রাজ্যগুলির বিস্তীর্ণ এলাকায় নিজেদের আধিপত্য কায়েমই এর উদ্দেশ্য।

সত্যিই কি কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা ভেবে বিএসএফের ক্ষমতা বাড়িয়েছে? তাহলে সীমান্তে বিএসএফ জওয়ানদের হাতে একের পর এক অত্যাচার-খুনের ঘটনায় বিজেপি নেতারা মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছেন কেন? উল্টে এর বিরোধিতা করলে দেশাত্মবোধের জিগির তুলে তাদের 'দেশদ্রোহী' তকমা দিচ্ছেন! সম্প্রতি কোচবিহারের সিতাইয়ে ৩ জন মানুষকে গরু চোরাচালানকারী সন্দেহে বিএসএফ গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে। সন্দেহের ভিত্তিতে এভাবে খুন মানুষের নিরাপত্তা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। বিএসএফের এক্তিয়ার বৃদ্ধির কেন্দ্রীয় সরকারের এই ফরমান সাধারণ মানুষ কোনও ভাবেই মেনে নিতে পারে না।

পাল্টায় শুধু সাইনবোর্ড

নাম পাল্টানোর হিড়িক পড়েছে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যে। রং তুলি দিয়ে মুছে দেওয়া হচ্ছে অতীতের সব নামধাম। উত্তরপ্রদেশে এলাহাবাদের নাম পাল্টে করেছে প্রয়াগরাজ। মুঘলসরাই রেলওয়ে জংশনের নাম পাল্টে করেছে দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন। ফৈজাবাদ স্টেশনের নাম পাল্টে করেছে অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট। মধ্যপ্রদেশের হাবিবগঞ্জ রেল স্টেশনের নাম পাল্টে করল রানি কমলাপতি স্টেশন।

কেন নাম পাল্টানো? এতে কি ওই এলাকার সাধারণ মানুষের কোনও উন্নতি ঘটবে? এর দ্বারা মূল্যবৃদ্ধি, বেকার সমস্যা, অপুষ্টি, অনাহার ইত্যাদি জনজীবনের গুরুতর সমস্যাগুলির কোনও পরিবর্তন ঘটবে? মুঘলসরাই স্টেশনে আগে যেমন পুঁজিবাদী শোষণে সবহারা মানুষের দল অনন্যোপায় হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করত, তা কি বন্ধ হবে দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন নাম করায়? নিরাশ্রয় হয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যারা রাতের প্রহরটুকু কাটাতে আসে, বা আসবে আগামী দিনে, সেই সব দরিদ্রদের আশ্রয় জুটবে? তাদের উপর পুলিশি হয়রানি বন্ধ হবে? এটা জানা কথা যে, কিছুই হবে না। বাস্তবে সাধারণ মানুষের জীবনের সাথে এই ধরনের নাম পাল্টানোর কোনও সম্পর্ক নেই। তাহলে বিজেপি এটা করতে গেল কেন? এর পিছনে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ সহ পাঁচ রাজ্যে ভোটের নিখুঁত হিসাব। আর রয়েছে বিভেদের আগুন নিয়ে প্রাণঘাতী খেলা।

প্রতিটি জায়গায় নামকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকার ইতিহাস জড়িয়ে থাকে। সেগুলো পাল্টানো শুধু ইতিহাস মুছে দেওয়া নয়, ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানো, যার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে ভ্রান্ত ধারণা। হাবিবগঞ্জ স্টেশনটি ভোপালের ভূতপূর্ব বেগমের পৌত্র হাবিবুল্লার অর্থানুকূল্যে, তাঁরই জমিতে হয়েছিল। বিজেপি তা পাল্টে করে দিল গোণ্ড জনজাতির রানির নামে। এর তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য বিজেপি থেকে মুখ ফেরানো জনজাতির মানুষদের কাছের লোক সাজতে চাওয়া। আর সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য হল আরএসএস উদ্ভাবিত হিন্দু-ঔদ্ধত্যবাদী সমাজ নির্মাণ। শোনা যাচ্ছে, 'আজমগড়'কে পাল্টে করবে 'আর্যমগড়'। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় মুসলিম স্মৃতি দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে দিয়ে দুটো উদ্দেশ্য ওরা সফল করতে চায়। এক) মুসলমানদের সন্ত্রস্ত করে তোলা, যাতে তারা নিরাপত্তার জন্য বিজেপির দোরেই হত্যে দেয়। দুই) সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে প্রকৃত সমস্যা থেকে তাদের চোখ সরিয়ে দেওয়া।

এর দ্বারা হিন্দুধর্মাবম্বী সাধারণ মানুষের কী লাভ হবে? উগ্র ধর্মাভিমানের ফাঁদে ফেলে অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে মানুষের জীবনের সব সঙ্কটকে সাময়িকভাবে হলেও ভুলিয়ে দেওয়ার এ এক মারাত্মক পুঁজিবাদী ষড়যন্ত্র। কোনও সচেতন মানুষ এ ফাঁদে পা দিতে পারেন? কোনও সুস্থ চেতনার মানুষ এই নিকৃষ্ট চর্চার বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে পারেন না।

ভোট রাজনীতির কী নিকৃষ্ট রূপ! কিন্তু সরকার এসব করতে পারছে কেন? এক অংশের মানুষও সহজেই এর মধ্যে যুক্ত হয়ে যাচ্ছেই বা কেন? এই অংশের মানুষ ধর্মবর্ণ জাতপাতের সুড়সুড়িতে আচ্ছন্ন হয়ে যে মাঝে মাঝে মানুষ সত্তা হারিয়ে গোষ্ঠী চেতনায় সংকীর্ণায়িত হয়ে পড়ছে তার প্রথম কারণটি হল দীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজের গণতন্ত্রীকরণের কাজটি সফল না হওয়া। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান ধারা আপসমুখী হওয়ায় তৎকালীন নেতৃত্ব এই জরুরি সংগ্রামে গুরুত্ব দেয়নি। স্বাধীনতার পর এই জরুরি কাজটি কংগ্রেস সহ তথাকথিত গণতান্ত্রিক দলগুলি কেউই করেনি। সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব ছিল বামপন্থীদের। কিন্তু বড় বলে পরিচিত বামদলগুলি এই দায়িত্ব পালন না করে ভোটের হিসাব-নিকাশে সামিল থেকেছে।

দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি দেখছে সংসদীয় সব দল ভোটের স্বার্থে কমবেশি ধর্মীয় মেরুকরণ ও জাতপাতের লাইনে হাঁটছে। পার্থক্য শুধু মাত্রায়, পরিমাণে। 'সেকুলারিজম' শব্দটি তোতাপাখির মতো আওড়ালেও এদের আচরণে, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোথাও তার চিহ্নমাত্র নেই। ফলে যথার্থ বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলন হলে, তার প্রভাবে জনমানসিকতার উত্তরণ ঘটার যে সুযোগ থাকে সেটাও অনুপস্থিত। এই শূন্যতার সুযোগ নিয়েই ধর্মীয় বিভাজনের মারণ খেলা চালাতে পারছে তারা। না হলে জোরালো প্রশ্ন উঠত, নাম পাল্টে কী হবে, পাল্টাতে যদি চাও, পাল্টাও দেখি বেকারত্ব, দারিদ্র, মূল্যবৃদ্ধি! শোষক পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাস হিসাবে বিজেপি সরকারের ভূমিকায় মানুষ ক্ষুব্ধ। এই অবস্থায় নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করতে বিজেপি সরকার নাম পাল্টানোর পথ নিয়েছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের প্রতিবাদই পারে এসব প্রতিরোধ করতে।

ক্ষতিপূরণ-পুনর্বাসনের দাবি

একের পাতার পর

জানা গেছে, এই এলাকায় ৩৪০০ একর জুড়ে উৎকৃষ্ট মানের কয়লা আছে। এখানে আছে বেশ কয়েকটি গ্রাম, যেখানে হাজার হাজার মানুষ বসবাস করেন। আছে বন-জঙ্গল এবং শস্যের খেত। যদি খোলামুখ খনি হয়, তবে খননকার্য কতদূর থেকে হবে তা সহজেই বোঝা যায়। ১২০০ ফুট নিচে নামতে গেলে, যে বিপুল পরিমাণ মাটি, পাথর উঠবে তা রাখার জায়গা লাগবে। তারপর প্রয়োজন হবে কয়লা মজুতের জায়গা। আবার কয়লা পরিবহণের জন্য রেল লাইন পাততে হবে। এর জন্য লাগবে অনেক জমি। এখানে যারা কাজ করবেন তাদের আবাসনের জন্য জায়গার প্রয়োজন হবে। স্বাভাবিক ভাবেই বিপুল সংখ্যক মানুষ জমি থেকে উচ্ছেদ হবেন। এর সাথে যে পরিমাণ ধূলো ও কয়লার গুঁড়ো বেরোবে তা অদূর ভবিষ্যতে আশেপাশের ফসলি জমিকে বন্ধ্যা করে দেবে। আর পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্টের বিপদ তো আছেই।

ফলে একদিকে জীবন-জীবিকা থেকে উচ্ছেদের আতঙ্ক, অন্যদিকে উন্নয়নের সম্ভাবনার এই প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন সমগ্র পরিকল্পনাটি নিয়ে এলাকার মানুষ, পরিবেশবিদ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, খনি বিশেষজ্ঞ সকলের মিলিত মতামতের ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু তা না করে প্রশাসনিক স্তরে সিদ্ধান্ত নিয়ে আর নামমাত্র কিছু পুনর্বাসনের প্যাকেজ ঘোষণা করেই এলাকাবাসীদের উচ্ছেদ করলে প্রতিরোধ হবেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে এস ইউ সি আই (সি) সরকারের কাছে ছয় দফা দাবি জানাচ্ছে। দাবিগুলি হল ঃ ১) খোলামুখ খনির পরিবর্তে আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনিং-এর সাহায্যে পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে হবে। ২) খনির কাজ শুরু করার পূর্বেই এই প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করে সকলকে পুনর্বাসন ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ৩) প্রতি পরিবারে অন্তত একজনকে স্থায়ী চাকরি দিতে হবে। ৪) কয়লা ব্লক কোনও উপায়েই বেসরকারি মালিকের হাতে দেওয়া চলবে না। ৫) বনসৃজন এবং পরিবেশ রক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে। ৬) খনি এলাকায় কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

কমরেড মদন ঘটক এলাকাবাসীকে নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর আন্দোলন এবং সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের দৃষ্টান্ত স্মরণ করে জীবন-জীবিকা রক্ষার জন্য ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ে সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এলাকাবাসীদের এই চরম অনিশ্চয়তা ও বিপদের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও চিন্তাশীল গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকেও এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ আঘাত করবে সব স্তরের মানুষকে

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান শীতকালীন অধিবেশনে 'ব্যাঙ্কিং রেগুলেশনস অ্যাক্ট' এবং 'ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ (অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড ট্রান্সফার অফ আন্ডারটেকিংস) অ্যাক্টস'কে সংশোধন করে যে ব্যাঙ্কিং ল'জ (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০২১' নিয়ে এসেছে তা পাশ করাতে চাইছে। একচেটিয়া পুঁজির মালিকানাধীন কর্পোরেট সংস্থাগুলির স্বার্থে রেল সহ বিভিন্ন সরকারি এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলিকে বেসরকারিকরণের যে প্রচেষ্টা কেন্দ্র জারি রেখেছে এটা তারই অঙ্গ। প্রবীণরা বেসরকারি ব্যাঙ্কের ইতিহাস জানেন। বিভিন্ন গল্প-উপন্যাস এবং তাকে ভিত্তি করে সিনেমাতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। গত শতাব্দীর ৪০, ৫০ বা ৬০-এর দশকে ব্যাঙ্কে মাঝে মাঝেই লালবাতি জ্বলত। তখন সব ব্যাঙ্কই ছিল বেসরকারি ব্যাঙ্ক। আমানতকারীদের জমানো টাকার বা ব্যাঙ্ককর্মচারীদের চাকরির কোনও নিরাপত্তা ছিল না বললেই চলে। হঠাৎ করে ব্যাঙ্কগুলি ডুবে যাওয়ার ফলে গায়েব হয়ে যেত ব্যাঙ্কে গচ্ছিত সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ। কর্মচারীরা হারাত তাদের কাজ। ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ হলে আবারও দেশের মানুষকে যেতে হবে নিরাপত্তাহীনতার সেই অন্ধকার বলয়ে।

বিগত কয়েক বছরের মধ্যে দেখা গেল গ্লোবাল ট্রাস্ট ব্যাঙ্ক, লক্ষ্মীবিলাস ব্যাঙ্ক, ইয়েস ব্যাঙ্কের মতো বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিকে ডুবে যেতে। দেখা গেল বেসরকারি আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে আর্থিক কেলেঙ্কারির নানা অভিযোগ উঠতে। লক্ষণীয় বিষয় হল, বহু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিই এগিয়ে গিয়েছে ডুবে যাওয়া ব্যাঙ্কগুলির বিপন্ন গ্রাহকদের উদ্ধার করতে। এরপরও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে বেসরকারিকরণের জন্য সরকার কোমর বেঁধে লেগেছে কার স্বার্থে?

গত কয়েক বছরে মোদি সরকার যে ভাবে ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ ঘটাল তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বেসরকারিকরণ। বিভিন্ন সময়ে ছোট-বড় বিভিন্ন সংযুক্তির মাধ্যমে ২৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক কমে ১২টিতে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে শুধু গত চার বছরে গ্রাহকদের সমস্যা বাড়িয়ে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ৩৩২১টি শাখা অফিস বন্ধহয়ে গিয়েছে। কমে গিয়েছে প্রায় ৭৪ হাজার কর্মচারী। শাখার সংখ্যা এবং কর্মী সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে পরিষেবা। যদিও পরিষেবা শুল্কের ক্ষেত্র এবং পরিমাণ, দু'টোই ক্রমবর্ধমান। স্থায়ী কাজে স্থায়ী কর্মীর বদলে নিযুক্ত করা হচ্ছে অস্থায়ী কর্মী। স্থায়ী কর্মী কমে যাওয়ার সাথে সাথে কন্ট্রাক্ট বা ক্যাজুয়াল কর্মীর সংখ্যা বাড়ছে। শিক্ষিত বেকার যুবকদের অল্প পারিশ্রমিক দিয়ে বেশি কাজ করিয়ে মুনাফা বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছে প্রায় প্রতিটি ব্যাঙ্ক। এক্ষেত্রেও চলছে যথেচ্ছ ছাঁটাই, যাকে বলে 'হায়ার অ্যান্ড ফায়ার'। একই উদ্দেশ্যে পার্ট-টাইম কর্মীদেরও সহজে ফুল-টাইম কর্মীতে পরিণত করা হচ্ছে না। বেসরকারিকরণ হলে এই সমস্যা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

বেসরকারিকরণ হলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ৩১ শতাংশ গ্রামীণ শাখার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে পড়বে। অন্যান্য সমস্যাও বহুগুণ বাড়বে। গরিব এবং গ্রামীণ গ্রাহকদের বিরাট একটা অংশ ব্যাঙ্ক পরিষেবার বাইরে চলে যাবে। প্রান্তিক চাষি, ছোট ছোট দোকানদার, আর্থিক দিক থেকে সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণির একটা বিরাট অংশও ব্যাঙ্ক-ঋণের অভাবে গ্রামীণ বিত্তশালীদের থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে সর্বস্বান্ত হবে।

দেশে মোট ব্যাঙ্ক আমানতের ৭০ শতাংশ রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে। বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে মোট জমা টাকার পরিমাণ ১০০ লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি। সরকারের সহায়তায় এই বিশাল পরিমাণ টাকার নিয়ন্ত্রক হতে চাইছে এদেশের ধনকুবের গোষ্ঠী। এই টাকার উপর ভিত্তি করে ঋণ দেওয়া হয়। ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণ ক্রমবর্ধমান। এই ঋণ না আদায়ের ফলে এগুলি ব্যাঙ্কের অনুৎপাদক সম্পদ (নন-পারফর্মিং অ্যাসেট বা এনপিএ)-এ পরিণত হচ্ছে। এই সম্পদ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে দিনে দিনে দুর্বল করে দিচ্ছে। সরকার বহু ক্ষেত্রে বড় বড় কর্পোরেট ঋণ মকুব করে দিচ্ছে বা অনুৎপাদক সম্পদের বোঝা কমাতে 'ব্যাড ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঘুরপথে জনগণের করের টাকায় সৃষ্ট সরকারি তহবিল থেকে ব্যাঙ্কগুলিকে অর্থ জোগান দিচ্ছে। ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের মধ্য দিয়ে জনগণের অর্থকে আরও যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে যাবে একচেটিয়া পুঁজির মালিকানাধীন কর্পোরেট সংস্থাগুলি।

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের এই প্রচেষ্টা সফল হলে তা শুধু ব্যাঙ্ক কর্মীদের উপর আঘাত হানবে না, আঘাত হানবে ব্যাঙ্কগ্রাহক সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উপর। দেশের আর্থিক দুরবস্থা আরও ত্বরান্বিত হবে। আর্থিক বৈষম্য সমাজের বুকে ভয়াবহ রূপে বাড়বে।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর থানার বহড়ু অঞ্চলের এস ইউ সি আই (সি) -র প্রবীণ কর্মী ও সংগঠক কমরেড রবীন ঘোষ ১১ নভেম্বর নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

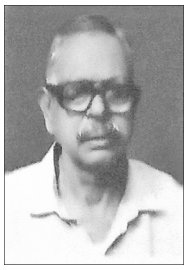

মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এলাকায় দলের নেতা ও কর্মীরা তাঁর বাড়িতে গিয়ে মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। ষাটের দশকে বহড়ু, শ্রীপুর, উত্তর দুর্গাপুর অঞ্চলে দলের দক্ষ সংগঠক কমরেড বেচুলাল ব্যানার্জীর মাধ্যমে তিনি দলের সঙ্গে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে জননেতা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী, কমরেড শচীন ব্যানার্জী, কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের মতো নেতাদের সংস্পর্শে তিনি কর্মী হয়ে ওঠেন। জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলানের নির্দেশে ক্যানিং ও বাসন্তী অঞ্চলে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতার টালায় থাকার সময় এলাকার কাজে যুক্ত হন। তিনি যে ঘরে থাকতেন সেই ঘরটি দলের কাজে ব্যবহৃত হত। পার্টির সমস্ত কর্মসূচিতে অংশ নিতেন। দলের মুখপত্র ও পুস্তিকাগুলি তিনি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করতেন। পরবর্তীকালে তিনি বহড়ুতে ফিরে আসেন। শান্তশিষ্ট, মিষ্টভাষী, যুক্তিবাদী রবীনবাবু সাধারণ মানুষের সাথে সহজে মিশতে পারতেন। সে কারণে তিনি গ্রামের মানুষের ভালবাসা পেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন সৎ, সহজ-সরল পার্টি সংগঠককে।

কমরেড রবীন ঘোষ লাল সেলাম

পুরসভা নির্বাচন

একের পাতার পর

জঞ্জালের ভ্যাট উপচে দুর্গন্ধ ছাড়ানো, আগের মতোই জঞ্জালের গাড়ি থেকে আবর্জনা উড়ে পথচারির গায়ে পড়া যেন এ শহরের ভবিতব্য! প্রতি বছর ঘুরে ফিরে আসে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়ার মতো মশাবাহিত রোগ। রোগ প্রতিরোধের নামে পুর বাজেটের যত অংশ খরচ হয় প্রচারে, তার থেকে অনেক কম হয় বাস্তব প্রতিরোধ ব্যবস্থায়। যক্ষ্মা রোগ কলকাতার বুকে নতুন করে জাঁকিয়ে বসছে, অথচ মেয়রস টিবি ক্লিনিক থেকে শুরু করে পুর স্বাস্থ্য ক্লিনিকগুলিতে ক্রমাগত কমছে পরিষেবা। কলকাতাকে লন্ডন করার কথা বলে বসেছিল ত্রিফলা আলো। তার পোস্টে এখন কোনও আলো নেই। বরং খোলা বিদ্যুৎবাহী তার ঝুলে থাকায় ত্রিফলা হয়ে উঠেছে এখন নাগরিকদের মৃত্যুদূত।

কলকাতা পুরসভায় জন্ম-মৃত্যুর সার্টিফিকেট থেকে শুরু করে ট্রেড লাইসেন্স ইত্যাদি যে কাজই হোক না কেন, নাগরিকরা জানেন দালাল না ধরলে কাজ হবে না। পুরসভার হেড অফিসেই ভোর পাঁচটা থেকে জন্ম-মৃত্যুর সার্টিফিকেটের জন্য লাইন দিতে হয় মানুষকে। বাড়ির সামান্য সারাই, ড্রেন পরিষ্কার কিংবা জলের সামান্য সমস্যা মেটাতেও দিতে হবে 'তোলা'। পুরসভার বিশাল ভবনের বহু ঘরই শূন্য, বরো কিংবা ওয়ার্ড অফিসগুলিতেও কাজের লোক নেই। ২৮ হাজারেরও বেশি কর্মীর পদ ফাঁকা। কোনও নিয়োগ হচ্ছে না। পরিষেবা দেবে কার? অথচ এই কলকাতা শহরই ভুগছে ভয়াবহ বেকারত্বের চাপে। সম্প্রতি নীতি আয়োগের সমীক্ষা জানাচ্ছে দেশের ৫৬টা মেট্রোপলিটন শহরের মধ্যে কর্মসংস্থানে কলকাতার স্থান হয়েছে সবচেয়ে পিছনে। এই কলকাতা পুরসভায় স্বাধীনতার পর ক্ষমতায় থেকেছে কংগ্রেস, তারপর দীর্ঘ সময় সিপিএম ক্ষমতায় থেকে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ কংগ্রেসের মতোই চালিয়ে গেছে। এসেছে তৃণমূল। শাসনের তরিকা দেখলে এদের কোনও পক্ষকেই আলাদা করা মুশকিল। নাগরিকদের উপর জলকরের বোঝা চাপানো, সম্পত্তি কর বাড়িয়ে সাধারণ নাগরিকদের পকেট কাটার কাজটা চালিয়েছে সিপিএম এবং তৃণমূল উভয়েই। সিপিএমই প্রমোটার রাজ কায়েম করে গরিব এবং মধ্যবিত্ত মানুষকে কলকাতা থেকে উচ্ছেদ করা এবং শহরকে ধনীদের কবলে তুলে দেওয়ার কাজ শুরু করেছিল। তৃণমূল এই কাজকে আরও বহুগুণ বর্ধিত করেছে। বস্তি উন্নয়নের কথা অনেকদিন শোনা গেলেও আজও এই কলকাতা শহরে অসংখ্য মানুষ ঝুপড়ি ঘরেই কোনও রকমে মাথা গুঁজে আছেন। বছর বছর আগুন লেগে জীবন ও যথাসর্বস্ব খোয়ানো যেন তাদের ললাটলিখন! এই 'এ-ওয়ান' শহর কলকাতায় দমকলের প্রয়োজনীয় উন্নত পরিকাঠামো আজও গড়ে ওঠেনি। তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি-র মতো দলগুলি আবারও জনগণের ত্রাতা সাজতে চাইছে। অথচ এরা সকলেই কোনও না কোনও সময়, হয় একা না হলে অন্যদের সাথে মিলে কলকাতা পুরসভার ক্ষমতা ভোগ করেছে। আর সমস্যা ক্রমাগত বাড়িয়ে গেছে।

সকলেই জানেন, বিজেপিবিরোধী চ্যাম্পিয়ন সাজতে চাওয়া সিপিএম বিজেপিকে নিয়ে বোর্ড চালিয়েছে। পৌর সমস্যার সমাধান, ম্যালেরিয়া ডেঙ্গু রোধ, পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদি দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এসইউসিআই (সি)। এই দাবিগুলি আদায় করতে, আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আসন্ন কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে এস ইউ সি আই (সি) প্রর্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানিয়েছেন দলের কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী।

এসইউসিআই(সি) প্রার্থী তালিকা

১. কমরেড সুবীর সামন্ত (ওয়ার্ড নং - ১৪)
২. কমরেড প্রত্যুষ সিকদার (ওয়ার্ড নং - ১৯)
৩. কমরেড সীমা সরকার (ওয়ার্ড নং - ৩৪)
৪. কমরেড জয়ন্তী মিত্র (ওয়ার্ড নং - ৩৮)
৫. কমরেড শ্রাবণী ব্যানার্জী (ওয়ার্ড নং - ৫১)
৬. কমরেড তপন মুখার্জী (ওয়ার্ড নং - ৫৬)
৭. কমরেড দেবু সাউ (ওয়ার্ড নং - ৭২)
৮. কমরেড প্রণব মাইতি (ওয়ার্ড নং - ৭৬)
৯. কমরেড সঞ্জিত কুমার রাই (ওয়ার্ড নং - ৭৯)
১০. কমরেড সুস্মিতা (পণ্ডা) পাল (ওয়ার্ড নং - ৮৩)
১১. কমরেড সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী (ওয়ার্ড নং - ৮৯)
১২. কমরেড হিল্লোল পাল (ওয়ার্ড নং - ৯১)
১৩. কমরেড শিখা বকসী (ওয়ার্ড নং - ৯৬)
১৪. কমরেড বুলবুল আইচ (ওয়ার্ড নং - ১০০)
১৫. কমরেড মমতাজ দেবনাথ (ওয়ার্ড নং - ১১৩)
১৬. কমরেড পিন্টু দাস (ওয়ার্ড নং - ১২০)
১৭. কমরেড আশীষ দন্ড (ওয়ার্ড নং - ১২৩)
১৮. কমরেড রীণা দত্ত (ওয়ার্ড নং - ১২৬)
১৯. কমরেড রীণা হালদার (ওয়ার্ড নং - ১২৯)
২০. কমরেড কাঞ্চন অধিকারী (ওয়ার্ড নং- ১৩৭)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

বিদ্যুৎ আইন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ অ্যাবেকার

বিদ্যুৎ এখন মুনাফার কামধেনু। পিডিসিএল, ডব্লুবিএসইডিসিএল ও সিইএসসি-র মতো সরকারি বেসরকারি সব বিদ্যুৎ সংস্থাই এখন দাবি তুলছে মাশুল বাড়াতে হবে এবং তা কার্যকর করতে হবে সম্মতি ছাড়া প্রিপেড মিটার চালু করা চলবে না, বিদ্যুৎ বিল সংশোধনী-২০২১ বাতিল করতে হবে। এদিন কলকাতায় বেলেঘাটা রাসমণি বাজারে গ্রাহক জমায়েতে নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

তাঁরা বলেন, ভবিষ্যতে যদি দাবি ওঠে ঠাকুর্দার আমল থেকে মাশুল বৃদ্ধি কার্যকর করতে হবে তা হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এটাই মুনাফার অর্থনীতির দস্তুর। পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনিবার্য পরিণাম। পাঁচ-ছয় বছর আগে থেকে।

এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে বিদ্যুৎগ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকা। ২৩ নভেম্বর বিদ্যুৎমন্ত্রী ও রাজ্যপালকে স্মারকলিপি দিয়ে অ্যাবেকা দাবি জানায় কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দিতে হবে, গৃহস্থকে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দিতে হবে, ক্ষুদ্র শিল্প ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিদ্যুৎ প্রতি ইউনিট ১ টাকায় দিতে হবে, এলপিএসসি ২৪ শতাংশের পরিবর্তে ব্যাঙ্করেট করতে হবে, গ্রাহকের

'৯০ সালে বিশ্বায়নের নামে যে উদার অর্থনীতি গ্রহণ করেন ইউপিএ জমানার অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং, সেখানেই বিদ্যুতকে পরিষেবা ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে মুনাফার পণ্য করা হয়েছে। আজ তার মাশুল গুনতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাসের নেতৃত্বে চার জনের প্রতিনিধি দল বিদ্যুৎমন্ত্রীকে এবং সহ-সভাপতি প্রদ্যুৎ চৌধুরীর নেতৃত্বে তিন জনের প্রতিনিধিদল রাজ্যপালকে স্মারকলিপি দেন।

পরিবহণ মন্ত্রীকে ডেপুটেশন বাইক ট্যাক্সি চালকদের

২৪ নভেম্বর কলকাতা সাবারবান বাইক ট্যাক্সি অপারেটরস ইউনিয়ন-এর পক্ষ থেকে গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ এবং আর এন মুখার্জি রোডের সংযোগস্থলে অবস্থান বিক্ষোভ হয় ও

পরিবহণ মন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে তিন শতাধিক বাইক ট্যাক্সি চালক যোগ দেন।

তাঁদের দাবি, বাইক ট্যাক্সিকে কমার্শিয়াল লাইসেন্স দিতে হবে, চালকদের পরিবহণকর্মী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, বাইক ট্যাক্সি চালকদের জরিমানা প্রথা অবলুপ্ত করতে হবে, পরিবহণে ব্যবহৃত জ্বালানির উপর থেকে সেস প্রত্যাহার করতে হবে, ওলা, উবের, র‍্যাপিডো নিয়োগকারী সংস্থাকে শ্রম আইন-এর অন্তর্ভুক্ত করে এই ব্যবস্থায় নিয়োজিত বাইক ট্যাক্সি চালকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের পিএফ-ইএসআই-গ্র্যাচুইটির আওতায় আনতে আইন প্রণয়ন করতে হবে। পুলিশি বাধা আসা সত্ত্বেও অবস্থান কর্মসূচি চলতে থাকে। পরে পরিবহণ দপ্তরে দাবিপত্র পেশ করা হয়। ইউনিয়নের সভাপতি শান্তি ঘোষ বলেন, আমরা গত ২২ নভেম্বর রেজিস্টার অফ ট্রেড ইউনিয়ন পশ্চিমবঙ্গ-এর পক্ষ থেকে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পেয়েছি। এর ফলে আমাদের ইউনিয়ন ভারতবর্ষের প্রথম রেজিস্ট্রিকৃত বাইক ট্যাক্সি ইউনিয়নে পরিণত হয়। এই অবস্থান মঞ্চ থেকে সেই সার্টিফিকেট ইউনিয়নের কার্যকরী সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পাতিয়ালায় বিশ্ববিদ্যালয়ে এআইডিএসও-র উদ্যোগে শহিদ কর্তার সিং সারাভা স্মরণ

ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের তরুণ শহিদ গদর আন্দোলনের নেতা কর্তার সিং সারাভার ১০৭তম শহিদ দিবস স্মরণ করল এআইডিএসও-র পাঞ্জাব শাখা। ১৬ নভেম্বর পাতিয়ালার পাঞ্জাবী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ ভগৎ সিং চকে শহিদের ছবিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এই উপলক্ষে মহান

মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তা সম্বলিত এআইডিএসও প্রকাশিত বই ও পত্রপত্রিকা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে

পাঞ্জাবী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঞ্জাবী সাহিত্য বিভাগের 'শহিদ কর্তার সিং প্রফেসর চেয়ার' আয়োজিত কর্তার সিং সারাভা স্মরণ অনুষ্ঠানে বিভাগীয় প্রধান ডঃ ভীম ইন্দর সিং ও গবেষকদের সাথে এআইডিএসও নেতৃবৃন্দ

সারাদিনব্যাপী প্রচার করা হয়।

ওইদিনই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঞ্জাবী সাহিত্য বিভাগে শহিদ কর্তার সিং প্রফেসর চেয়ার আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন বিভাগীয় প্রধান ডঃ ভীম ইন্দর সিং। শহিদ কর্তার সিং সারাভার জীবনসংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে আজকের সামাজিক প্রেক্ষাপটে তার প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করেন সংগঠনের পাঞ্জাব শাখার আহ্বায়ক কমরেড শিবাশিস প্রহরাজ এবং সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ।

বিভাগের পক্ষ থেকে বিভাগীয় প্রধান বামপন্থী মতাদর্শের কিছু বই উপহার দিয়ে সংগঠনের নেতৃত্বকে সংবর্ধিত করেন। সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির পক্ষ থেকেও উপস্থিত সকল ছাত্রছাত্রী ও বিভাগীয় প্রধানের হাতে সংগঠনের বিভিন্ন প্রকাশনা তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া ছাত্রছাত্রীরা জানান জীবন সম্পর্কে এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তাঁরা পেলেন।

এ দিন বুঢলাডার জি এন ডিগ্রি কলেজে শহিদ স্মরণে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শ্রেয়া সিং। ভাটিন্ডা শহরের খালসা সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল ও দেশরাজ মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলে শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এবং শিক্ষকমণ্ডলী অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা করেন সংগঠক কমরেড শিবানীশঙ্কর মিশ্র।

ব্যাঙ্কে হয়রানি বন্ধের দাবি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের

অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকারা লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে ব্যাঙ্কে গিয়ে নানা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। জীবিত কিনা এটাই মূল বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু বহু ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এর সঙ্গে নানা ডকুমেন্ট জুড়ে জটিলতা সৃষ্টি করছেন। এক এক ব্যাঙ্ক অনলাইনে এক এক রকম ডকুমেন্ট চাইছে। কারও মাধ্যমে পাঠানোর অর্ডার থাকলেও তা কার্যকরী করছে না কোনও ব্যাঙ্কই। অসুস্থ এবং বয়স্ক শিক্ষকরা পড়ছেন চরম বিপদে। ফর্ম পেতেও হয়রান হতে হচ্ছে। অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, একই রকম নির্দেশিকার ভিত্তিতে লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক এবং হয়রানি বন্ধ করা হোক।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com